নীরদ চৌধুরী ঃ তিনটি অনুষঙ্গ

ধীমান দাশগুপ্ত

òÏõþð ËäÌñÅõþÏ Ð ¿îò¿é ÕòÅø/ Ð æ±õ±¿ù, ò¿äËßî±, Î÷±Ž÷Óùõþ

In my absence after my death no Bengali will recollect me as a person as worthy of any consideration. Needless to say, now abroad I introduce myself as a 'Bengali Hindu' or a 'Hindu Bengali'; I never reveal my identity to others as an Indian' …still I will never be considered by any other of my race as a superior Bengali. No imprint of my personality or writings will leave any impression on the Bengali way of life, nor will I through my writings ever affect any transformation in the stone. Yet as a writer that I will become an entertainer for my Bengali readers, of this do I remain confident? Just this much conviction I dare to possess.'

|Ï |Ï òÏõþðäf ËäÌñÓõþÏ¼¼

Nirod Chandra Choudhuri ট্র.চ.ড্র. ণ্ড্রস্ফ. ডড ন্দ্ধ ছট্রস্সন্তস্ফগ্ন ডডক্ত. ল্পুন্ন ছত্রন্ধ্বন্ডজপ্তন্ডন্ধ্রন্ধক্রস্তু ডডন্দ্বন্ধনস্সন্ধ্ধক্ষণ্ড্র

ছদ্দনন্ধুল্প-চড্রক্তক্রন্ধনগ্ন, ঠন্দ্বপ্তপ্তস্ভ্র স্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব ত্মস্সভ্তন্দ্বপ্ত নন্ধন্দ্বক্তক্রজন্ত ত্রস্সন্তনন্দ্বন্ধন্তু

óï ›¶ðúÇß äù¿BäÛ¦Ú©†± Ëë¿öë ëõ¿ùØ ¿áè¿ôï Ëû÷ò ¿òËæõþ ü¥óËßÇ Ûßõ±õþ ß±áËæ ¿õ# ±óò ¿ðËûþ¿åËùò Ûý×ö±Ëõ---

ডড্ন. ণ্ডক্তনন্দ্রন্দ্রনন্ধড়

ত্মন্দ্বল্পস্সপ্তত্বন্ধনস্ফনম্ভ্রন্ডন্ধ ত্তস্সন্ধনস্ফ ত্নন্তন্ধত্বক্তন্দ্ব ডডক্তক্রন্থ্র

ট্রুস্তু ঠস্সক্তুস্তুন্ডন্ধ ন্ধড়ন্দ্ব ত্তস্সস্তুন্দ্বক্তু বন্দ্বন্তড়ুনশুত্বন্দ্ব স্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব ট্রক্তজন্ধ.

---òÏõþðäf ËäÌñÓõþÏ Ëî÷¿ò ¿òËæõþ ß±ëÇ å±óËî ó±õþËîò Ûý×ö±Ëõ----

ত্ত্বনক্তজস্সস্তু ট্র. ট্রড্রত্বস্তুড়ত্বক্তজন

ড্রপ্রন্ধক্তক্রস্সক্তজস্তুন্ত্রক্তজন্ত ত্রন্তড়স্সপ্ত্রক্ত

ণ্ডন্দ্রন্ধন্দ্বস্তু ণ্ণস্সত্বক্তক্রপ্তনন্দন্ধ

ট্রুস্তু্ব ক্তজনন্ধন্দ্বক্ত-স্মন্ত্রক্ত-ড্রপ্রন্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বন্তন্দ্ব

নীরদচন্দ্র ছিলেন, বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে, বাঙালী সত্তা ও ভারতীয়ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ , য‌ঁাকে শেষদিন পর্যন্ত অধিকাংশ বাঙালি ও ভারতীয়ই 'দেশদ্রোহী'বা 'সাম্রাজ্যবাদের চাটুকার' বলে গাল দিয়ে গেছেন। নীরদবাবুর নিজের কথ ায় তাঁকে তিনপুষ ধরে বাঙালী গাল দিয়ে আসছে। বর্তমানে যারা যে গাল দিচ্ছে, তাদের বাবাদের জেনারেশানও সেই গাল দিতেন এবং ঠাকুরদার প্রজন্মও ঠিক একই গাল দিতেন। কিন্তু তিন প্রজন্মের নিন্দাবাদ সহ্য করেও, বা বলা যায়, জ াবালির মতো, গালাগাল উপভোগ করেই, নীরদচন্দ্র তাঁর নিজস্ব অবস্থান ও বিশ্বাসে অটুট ও অনড় ছিলেন এবং এই পাশ্চ াত্য মনোভাবাপন্ন, অবাঙালীসুলভ বাঙালীটি ছিলেন বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির এক চরম আদর্শের আলোকস্তম্ভস্বরূপ। সারা জীবন ধরে ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি আদবকায়দা ও রীতিনীতি, তথা য়ুরোপিয় ঐতিহ্যকে অনুসরন করলেও তিনি ভেতরে ভেতরে সাচচা বাঙালী ও প্রকৃত ভারতীয়। যদিও তাঁর বাঙালী সত্তা ও ভারতীয়ত্বের প্রকৃতি একটু জটিল। তাঁকে

বলা হয়েছে ভারতীয় চিন্তা ভাবনা ও ধ্যানধারণার জগতে তিনি 'এক উপগ্রহস্বরূপ'। এই জ্যোতিষ্কটি তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে যা সত্য বলে জানতেন ও বুঝতেন তাকে, সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে, সুতীব্র ভাবে প্রকাশ করে গেছেন, কোনো বিরোধিতাই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'--- এই নীতিতে বিশ্বাসী নীরদচন্দ্র তাঁর অধ্যয়ন, চিন্তন, মনন, নিদিধ্যাসনে যে সত্য উপলব্ধি করেন তা দ্ব্যর্থহীন ঋজু ভাষায় প্রকাশ করেন। না, কোনো বোঝাপড়া বা কম্প্রোমাইজে তিনি যাননি। ব্রিটিশ সভ্যতা সংস্কৃতি আদবকায়দা রীতিনীতিতে যাঁর এত আকর্ষণ সেই তিনিই যে শুধু বর্তমান ইংরেজ জাতির নয়, আধুনিক য়ুরোপিয় সভ্যতারই, অবনতিকে তীব্র ভাষায় আত্রমন করেছেন সেই ব্রুদ্ধসমালোচনার খবর বাঙালী রাখে!

আর এসবের সঙ্গে ছিল নিজের জ্ঞান, মনন ও লিখনক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, যার ফলস্বরূপতাঁর 'অহংকারী' এই তক্মাটি জোটে। সব মিলিয়ে, দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাঁকে নিয়ে বিতর্ক, তিনিই সর্বদা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি নিয়ে তিনি কালকে পর্যবেক্ষন করতেন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সেই পর্যবেক্ষনকে প্রকাশ করতেন সুগভীর প্রত্যয় ও প্রচন্ড সাহসের সঙ্গে। জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ছিল তির্যক, তাঁর মতামত ও মন্তব্যগুলিও তেমনি ছিল তির্যক আর তার ভাষা শৈলী সূচীতীক্ষ্ণ। তার চেয়েও বড় কথা, দেশ ও কালের বর্ননা দিতেন তিনি সব সময়ই নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে। তাঁর নিজের কথায় রামকৃষ্ণ সর্বদাই উপদেশ দিতেন --- 'অহংজ্ঞান ত্যাগ করবি'। আমি এটাই পারি নাই। আমি অহংজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সুতরাং নিজের কথাবলা ভিন্ন অন্যের কথা লইয়া মাথা ঘামাই নাই। এই প্রবল অস্মিতার কারনেই তাঁর প্রতি আরও গালাগাল বর্ষিত হয়।

নীরদবাবুর সমসাময়িক আর এক অতিবিশিষ্ট বাঙালী মনীষী ও ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে, নীরদবাবুর লেখায় তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ। সব লেখকের ক্ষেত্রে এটাই তো স্বাভাবিক। এতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কি আছে? ভারতের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক, পারস্পরিক মেলবন্ধন, প্রভাব ও প্রতিত্রিয়া, এসব রয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর বিশ্বাস ইংরাজী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই ভারতীয় চিন্তায় মনে সাহিত্যে সাবালকত্ব এসেছে। এ হচ্ছে নীরদবাবুর নিজস্ব চিন্তা ও অভিমত। হয়ত কিছুটা সত্য, কিন্তু পুরোটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। তাঁর অনেক মতামত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তাঁর অদম্য শক্তি ও সাহস, তাঁর লেখায় এত ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হবারই কথা।

তাঁর যুক্তি, তাঁর মনন, তাঁর বিচারশক্তি, তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর গ্রন্থগুলিকে এমন আমোঘ করে তুলেছে যে সেগুলির প্রতিটিকে এক একটি সংক্ষিপ্ত গাণিতিক সূত্রের মত সুত্রবদ্ধ করা যায় ---

অটোব্যয়োগ্রাফি অব্ অ্যান্ আননোন ইন্ডিয়ান এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক যে খ্যাতি ও সাফল্য অর্জন করেন এ-গ্রন্থ তার কোনো পূর্বাভাস নয়, পরিবর্তে লেখকের সেই আত্মবিশ্বাসের প্রগাঢ় ও অভিঘাতি বিবরণী যা তাকে অপরিচিত এক ভারতীয় থেকে তাঁর সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকে রুপান্তরিত করে।

এ প্যাসেজ টু ইংলন্ড 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' গ্রন্থের অ্যান্টিথেসিস।

দ্যা কন্টিনেন্ট অব সার্সি তাঁর সময়কার ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস ও এক বিশিষ্ট বাঙালির (অর্থাৎ লেখকের) কাহিনিকে বাদ দিয়ে যে ইতিহাস লেখা যেত না, যায় না।

ক্লাইভ অব্ ইন্ডিয়া রবার্ট ক্লাইভের জীবনী, ভারতের ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও কৃষ্টি (যদি কৃষ্টির কথা আদৌ বলা যায়) থেকে ভারতে উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। ফলে একদিক থেকে বলা যায়, গোটা বইটি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য ও স্মৃতির প্রতি নিবেদিত ও উদ্দিষ্ট।

স্কলার এক্সট্রাঅর্ডিনারি এ তো নীরদচন্দ্রের লেখা ম্যাক্সমূলরের জীবনীগ্রন্থ নয়, নীরদচন্দ্র নিজেও যে এক স্কলার এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তাঁকেও ন্যায্যতই বলা যেতে পারে 'মোক্ষমূল'।

দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক । ও, শিবসদৃশ, দ্রপ্রতিম, তুমি যে ভয়ংকর, তোমার ক্রোধের থেকেই যে এই প্রলয়নাচন --- বিশ শতকের বিশ্ব ইতিহাসে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ -- এক চমকপ্রদ সুপার-ইম্পোজিশন।

থ্রি হর্সমেন অব দি নিউ অ্যাপোক্যালিপ্স্ আধুনিক সভ্যতার বিশ্বব্যাপী ভাঙন ও বিনাশের নির্মোহ ভাষ্য, যে অবজেকটিভ বিবরণী গভীর ইতিহাসচেতনায় বিশ শতকের ইতিহসকে চিরে চিরে দেখায় এই ব্যাখ্যা পেসি-অপ্টিমিস্টি না

অপ্‌টিপেসিমিস্টিক? -- এক মননশীল পলিফেনিক মনতাজ।

হিন্দুইজম 'হিন্দুইজম' থেকে 'হোয়াই আই অ্যাম এ হিন্দু' (নীরদ চৌধুরী) থেকে 'হোয়াই আই অ্যাম নট এ হিন্দু' (বাবাসাহেব আম্বেদকর) - তে বিবর্তন।

দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়া এ থেকে ও এখান থেকে আমরা আসি 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল' - এর কথায়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়, 'তিনি বিলেত চলে গিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, স্বেচ্ছানির্বাসনে নয়। তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিলেত চলে যান, বোধহয় তার উচ্চাশা ছিল। একদিক থেকে এটা তাঁর পক্ষে তো ভালই হয়েছিল। ইংরেজদের দেশেই থেকেছেন, তাঁদের ভাষায় বই লিখেছেন। স্বীকৃতি, সম্মান, অর্থ সবই পেয়েছেন। এখন তাঁর জন্য আমাদেরও গর্বিত ও আনন্দিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাঙালী জীবনে রমণী বইখানার বিষয় বাঙালী জীবনের একটা বিশেষ যুগে পুষ ও নারীর সম্পর্ক যে বিশিষ্ট রূপ ধরেছিল তার একটা নিবিড় ও মনোগ্রাহী বিবরণ। গ্রন্থটিকে জাক্সটাপোজ করা যায় লেখকের 'হিরোইন্‌স্ অব্ টেগোর' প্রবন্ধের সঙ্গে, যা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে নায়িকাদের মানসিক রূপরেখাকে তুলে ধরে।

আত্মঘাতী বাঙালী বাঙালী জীবনের জাতীয় সংকট থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার ও মুক্ত করার এক উপায় অনুসন্ধান। আত্মঘাতী বাঙালী বনাম জাবালি নীরদচন্দ্র।

আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ এ কি সত্য যে শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথও হয়ে পড়েছিলেন আত্মঘাতী? তাহলে রবীন্দ্রনাথ বনাম অকৃতজ্ঞ নীরদচন্দ্র---এই সংঘাত বা সন্নিধিই কি আমাদের বিবেচ্য? না কি বিবেচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের সংকট বনাম নীরদচন্দ্রের সংকটানুসন্ধান?

আমার দেবোত্তর সম্পত্তি সেইসব বাঙালীর ওপর এক তীব্র ও প্রবল আঘাত যাঁরা 'নিজ সন্তানদের বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সেই কারনে বাঙালী সংস্কৃতিরূপী দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে নিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঞ্চিত করেছেন। নিজ সন্তান-সন্ততিদের স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বীয় সংস্কৃতির ভূমির সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দিয়ে তাদের মানুষ্য-দেহধারী শৈবালদামে পরিণত করার ব্যবস্থা করেছেন।'

প্রকৃতপক্ষে, নীরদচন্দ্র বাংলাতেই লিখুন বা ইংরেজিতে, দেশে বসেই লিখুন বা প্রবাসে, আর যে-দেশেরই ইতিহাস নিয়েই লিখুন না কেন, তাঁর একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল আদর্শ বাঙালীয়ানার পরিপোষণ, বাঙালীর স্থানিক - আঞ্চলিক দৃষ্টিকে, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋিপথিক ভূমিকায় উত্তরিত করা। ইতিহাসে বোধোদয় আর কেউ কখনো এইভাবে ইতিহাসচর্চা করেনি।

বাঙালীকে ঋিপথিক করার, এক শাশ্বতত্বের অভিব্যক্তি দেবার এই প্রয়াসে নীরদচন্দ্র, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি। তাই, ন্যায্যতই বলা হয়েছে,'নীরদচন্দ্র একাধারে বাঙালী, ভারতীয় ও ঋিনাগরিক বলে তাঁর বাঙালী অস্মিতা সঙ্কীর্ণ নয়, উদার গ্রহণশীল।' (--- শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। আর সেই কারনেই তাঁর বাঙালী সত্তায় শাশ্বতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ আছে।

নীরদবাবুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারীর প্রথম সাক্ষাৎকারের এই বিবরণীতে এবার আসা যাক

সুভাষচন্দ্র সরকার আপনি আর বাংলাতে লেখেন না কেন?

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে) বাংলা --- বাংলা আবার ভাষা নাকি? মৃত জাতির মৃত ভাষা। এতে কেউ লেখে নাকি?

সুভাষচন্দ্র (চিৎকার করে) কী বললেন? বাংলা মৃত জাতির মৃত ভাষা।

নীরদচন্দ্র (শান্ত স্বরে) আপনি রাগ করলেন? কিন্ত কোনো জাতি মৃত না হলে দেশবিভাগে রাজি হয়।

সুভাষবাবু চুপ করে যান।

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের বাস্তববাদের সঙ্গে নীরদ চৌধুরীর সাহিত্যকর্মের একটা যোগসুত্র আছে। তাই তিনি বলেন, বলতে পারেন 'লেখা আমার ব্রত বলিয়া আমার মনে যাহা আসে তাহাই লিখি। কিন্ত আমি মনে করি নাআমি যাহা লিখি তাহা কেবল আমারই মনের ফসল। অর্থাৎ আমার নিজের মনের ধারনা মাত্র বা অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে যাহা জন্মায় তাহাই।

আমি আমার মনকে একটি ক্যামেরা বানাইবার চেষ্টা করি। যাহার উপরে উহা খুলিয়া ধরা হয় তাহার ছায়া লইয়া ফে াটোগ্রাফের নেগেটিভের মত তাহাতে কিছু সৃষ্টি হয়। আমার কাজ ঐ নেগেটিভ পরিস্ফুট করা ও ছবির প্রিন্ট লওয়া। ছবিকে সুন্দর করার জন্য অক্ষত নেগেটিভে যাহা নাই তাহা প্রিন্টে থাকিতে দিই না।

এই কারনে নীরদচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি চলচ্চিত্র মাধ্যমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, যে বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

দুটি বিশেষ প্রতিন্যাস থেকে নীরদচন্দ্রের প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ---

বাঙালী জীবনে রমনী একটি সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বইখানার বিষয়, লেখকের মতে, বাঙালী জীবনের একটা বিশেষ যুগে পুষ ও নারীর সম্পর্ক যে বিশিষ্ট রূপ ধরেছিল তার একটা বিবরণ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। একটা বিশেষ কালপর্বে ব্যক্তি হিসাবে নরনারীর মধ্যে যে নিবিড় ও বিশিষ্ট মানসিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পরিধিই তাঁর আলোচনার গন্ডী। বইটার বিষয়বস্তু বাঙালী জাতির মানসিক ইতিহাসের আধুনিক কালের মধ্যে আবদ্ধ। এই সময়টা দেড়শো বছরের। যে যুগটা আবার আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের কাল। এই প্রভাবের ফলে ব াঙালীর মনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হতে আরম্ভ করে কতগুলো জিনিস একেবারে নতুন করে দেখা দিল --- যেমন, মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারনা ইত্যাদি, আর কতগুলো জিনিস নূতন ভাবে দেখা শু হল --- যেমন, ঈশ্বর, নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক ইত্যাদি। লেখকের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীরা ইউরোপীয় ও হিন্দু এই দুই ধারার সমন্বয়ে নরনারীর সম্পর্কের যে একটা নূতন ধারনা করেছিল --- যার প্রকাশ সমস্ত বাংলা সাহিত্য জুড়ে আছে, এবং যে ধারনাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকটা কাজে পরিণত করেছিল, তা নূতন সাহিত্য, গান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা ধর্মান্দোলনের মতো বর্তমান যুগের বাঙালীর একটা বড় কীর্তি।

কাম ও প্রেম প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র কামকেই নরনারীর সম্পর্কের অবলম্বন বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে নরনারীর সম্পর্কের ধারনা, কামের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে কাম মোটেই নীচ বা নিন্দনীয় ব্য াপার ছিল না। এবং সর্বত্র কামের একটিমাত্র রূপই দেখতে পাওয়া যেত না, নানান রূপ দেখতে পাওয়া যেত। যেমন প্র াচীন ভারতবর্ষে কামের একটা রোমান্টিক রূপও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মূলত কামই ছিল মুখ্য।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে অকস্মাৎ একটা ভাববিপ্লব দেখা দিল। এর জোয়ারে বাঙালী জীবনে প্রেম অর্থাৎ রে ামান্টিক প্রেম দেখা দিল। এর প্রবর্তনকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কাম থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রেমমুখীন হতে হবে --- ঊনবিংশ শতাব্দিতে বাঙালী জীবনে নরনারীর সম্পর্ক ঘটিত ভাব বিপ্লবের মূল সূত্র এটাই।

বাঙালী জীবনে ভালোবাসার ধারনা বাঙালীর জীবনে নূতন ভালোবাসা দেখা দিলো। তা এল ইংরাজী শিক্ষার মারফৎ ইংরাজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ হতে। তাকে জীবনে অঙ্গিভূত করবার জন্য বাঙালী সর্বতে াভাবে সচেষ্ট হল। বাঙালীর সামাজিক জীবনের পুরাতন ধারার সঙ্গে কী করে নূতন ভালোবাসার সমন্বয় করা যায়, সেই হিসেবটা প্রথম থেকেই সজ্ঞ ানে করা হয়েছিল। বাঙালীর এই ভালোবাসা কলকাতায় দেখা গেল এক রূপে, পল্লীজীবনে অন্য রূপে।

নূতন ভালোবাসা যখন বাঙালী জীবনে পূর্নবিকশিত হয়ে উঠল তখন দেখা গেল যে, তা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে একেবারে মিশে আছে। এই সৌন্দর্যের অনুভূতিও প্রেমের অনুভূতির মতোই নূতন ব্যাপার। বাংলার প্রাকৃতিক রূপের সঙ্গে নূতন প্রেমের অঙ্গাঙ্গীকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তেমনই প্রখর।

প্রেমের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ের মতো প্রেমের সঙ্গে সতীত্ব বা পাতিব্রত্যের সমন্বয়ের চেষ্টাও বাঙালী করেছিল। শুধু প্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেমের সামঞ্জস্য কখনও হয়নি। বরং প্রথম থেকেই দেশপ্রেমের সঙ্গে নারীপ্রেমের বিরোধ বেধেছিল। দেশ ও নারীর মধ্যে এক নিরর্থক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। ভালোবাসা একবার আরম্ভ হলেও পরিণতি পাবার জন্য, এমনকি বেঁচে থাকবার জন্যও মন ও বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। প্রেমের জন্য সেই বুদ্ধির প্রয়োজন যা নারীপ্রকৃতিকে আরও জীবন্ত করে তোলে। আর প্রেমের জন্য যে মনের প্রয়োজন হয় তা সেই মন যাতে জীবন ও প্রেম প্রতিফলিত হয়, যা জীবন ও প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারে। কিছুকালের জন্য হলেও বাঙালী সেই মন ও বুদ্ধি অর্জন করেছিল।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত 'ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ বাঙালীর কাছে খেটক--খর্পরধারিনী করালী মূর্তিতে আ বির্ভূতা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দিতে তিনি আমাদের কাছে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাই প্রেমের প্লাবনে

আমাদের হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল।' --- শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধূরী।

কিন্তু তা সুগভীর ও পুরোমাত্রায় ব্যাপক হয়নি। প্রথম বাংলা দেশে সম্পর্কঘটিত ব্যাপারে সকল দিক থেকে নূতন ধ্যান-ধারনা ও আচরন দেখা দেবার পরও পূর্বযুগের আচরন মোটেই লোপ পায়নি। বাঙালী সমাজের সর্বত্র নূতন ধারার পাশে পাশে পুরাতন ধারা দেখা যেত ও এখনও যায়। ফলে বাঙালী নারীকে হাজারো ত্রস-কারেন্টের বিদ্ধে লড়াই করতে হয়। সেই অসম লড়াইয়ের কুফল পরে বাঙালী নারীর সত্তায়। দ্বিতীয়ত অনুভূতির যে গভীরতা ও শক্তি থাকলে নূতন ভালোবাসা বাঙালীর একেবারে ধাতস্থ হয়ে চিরস্থায়ী হতে পারত --- তা বাঙালী চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। তার উচ্ছ্বাস পরায়ণতা আছে কিন্তু আবেগের জোর নেই। তাই শুধু প্রেম কেন, বাঙালী জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষে যা কিছু বড় জিনিস এসেছিল --- যেমন দেশপ্রেম, ধর্মপরায়ণতা বা নৈতিক বোধ --- সবকিছুরই আজ অবসান ঘটেছে। তাই ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপান্তর হয়েছে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা থেকে কালীকরালী মুর্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কাহিনীর শেষ কথা যা, বাঙালীর প্রেমের কাহিনীর শেষকথাও তাই --- ' বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

এই গ্রন্থ তাই প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জনের কাহিনি। আর বইটি লেখক উৎসর্গ করেছেন এইভাবে --- যে ভালোবাসার কাহিনী এই বই - এ লিখলাম তাহারই উদ্দেশ্যে এই বইখানা উৎসর্গ করিলাম। আর আমাদের এই সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়তো এইভাবে উৎসর্গ করা যায় --- অজাত সেই কন্যাভ্রূনকে যাকে বিনষ্ট করা যাবে না। এই ভাবেই আলোচ্য প্রেম সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারে।

মোক্ষমূল --- একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আলোচনা যদি প্রেমবিষয়ক হয়ে থাকে, নিম্নোক্ত আলোচনা তাহলে জ্ঞানবিষয়ক।

১৮২৩ লনে জরমনির ডেসাউতে ম্যাক্সমূলরের জন্ম। নীরদচন্দ্র চৌধূরীর জন্ম বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে ১৮৯৭ সনে। ম্যাক্স মূলর হলেন বিখ্যাত কবি ভিল্‌হেলম মূলরের একমাত্র পুত্র। তাঁর কিছু কবিতার গীতিরূপ দেন ফ্রাঞ্জশুবার্ট। নীরদচন্দ্রের পিতা উপেন্দ্রনারায়ন চৌধুরী ছিলেন পেশায় উকিল, তাঁর চারিত্রশক্তি ও ব্যক্তিত্বের তন্নিষ্ট বিবরন দিয়েছেন নীরদচন্দ্র।

১৮৩৬ সন অবধি ম্যাক্সমূলর ডেসাউ গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করেন। নীরদচন্দ্র স্থানীয় জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন ১৯০৯ সন অবধি। ম্যাক্সমূলর লাটিন ও গ্রিক অধ্যয়নের ইচছা নিয়ে লাইপজিগ ৰিবিদ্যালয়ে ভর্তি হন, ১৮৪১-য়ে। কিন্তু এই দুই ভাষার অধ্যয়ন তাঁর কাছে একটু নীরস লাগায়, তিনি সদ্যস্থাপিত সংস্কৃত বিভাগে যোগ দিয়ে গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা শু করেন। নীরদচন্দ্র ইতিহাসে প্রথম শ্রেনীর অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষা পাশ করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতা ৰিবিদ্যালয়ে যোগ দেনকিন্তু এম. এ. পরীক্ষায় তাঁকে দু-দুবার ফেল করতে হয়।

১৮৪৩ সনে দর্শনে ডক্টরেট পেয়ে ম্যাক্স মূলর পরের বছরই বার্লিন ৰিবিদ্যালয়ে চলে আসেন, উদ্দেশ্য ---সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শন নিয়ে ফ্রাঞ্জ বপের তত্ত্বাবধানে আরও গবেষণা (বপ হলেন তুলনামুলক ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা) এবং স্বনামধন্য দার্শনিক শিলিংয়ের অধীনে তুলনামুলক দর্শন বিষয়ে চর্চা। নীরদচন্দ্রের কর্মজীবন শু হয় সাংবাদিক হিশেবে এবং ইংরেজি ও বাংলায় সমান দক্ষতায় লিখতে থাকেন তিনি। কবি ও প্রাবন্ধিক মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন তখন তাঁর সাহিত্যগু। ১৯৪৭ - য়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, নীরদচন্দ্রের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি ও তাঁর প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব্ অ্যান্ আননোন ইন্ডিয়ান। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র খ্যাতি ও স্বীকৃতি পায়। নীরদচন্দ্র হয়ে ওঠেন ইংরেজি ভাষার ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

১৮৪৬ সনে ম্যাক্সমূলর আসেন ইংলন্ডে সংস্কৃত পান্ডুলিপি সংকলন ও সংগ্রহ করতে। ইতিমধ্যে তিনি ঋগ্বেদের জরমন অনুবাদ শু করেছেন যার প্রথম খন্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৯-য়ে, ষষ্ঠ তথা শেষ খন্ডটি ১৮৭৪-য়ে। ঋগ্বেদের এই মুদ্রিত অনুবাদ ভারতে ও ইউরোপে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে। ঋগ্বেদের মুদ্রণ চলাকালিন ম্যাক্স মূলর ১৮৪৮ - এ অক্সফোর্ড চলে এসে বাকি জীবন সেখানেই কাটান। নীরদচন্দ্র ১৯৭০-যে ইংলন্ডে যান ম্যক্সমূলর জীবন ও কর্ম বিষয়ে বই লিখতে, যে বইয়ের নাম দেন তিনি 'স্কলার এক্সট্রা - অর্ডিনারি।' পরে নীরদচন্দ্র অক্সফোর্ডে চলে আসেন, বাকি জীবন সেখানে কাটান, কাটান একটার পর একটা বই লিখে।

শুধু ঋগ্বেদের অনুবাদ নয়, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটির পর একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেম্যাক্স মূলর ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরন ঘটান, পাশ্চাত্ত্য জগতে তিনিই হয়ে ওঠেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। জীবনের শেষ পর্বে বেদান্ত দর্শন তাঁকে এত আকৃষ্ট করেছিল যে তাঁর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন 'ম্যাক্স মূলর হলেন বেদান্তবাদীদের বৈদান্তিক। বেদান্তের মাধুর্যের প্রকৃত ব্যঞ্জনা বাস্তবিক তাঁর কাছেধরা পড়েছে।' ইতিহাস ও সমাজ - সংস্কৃতি সম্পর্কে একটির পর একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী জীবদ্দশায় হয়ে ওঠেন ৰ্ক্র ন্দ্বপ্রব্ধজ্জ্রপ্সজস্তন্দ্রজম্ভ ব্দন্তড়প্সপ্তজ,ত্র ন্দপ্সন্তজ্জপ্তন্বদ্ধক্রস্ত ভ্রজন্ধন্দ্বজ- স্মান্দ্বজ-ন্দ্বপ্রন্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বস্তন্দ্ব.'ü±î দশকের ও বেশি সময় ধরে এমন সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি লিখে গেছেন যে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন 'òÏõþðõ±õÅ ýËùò Õ±ñÅ¿òß ò¿äËßî±¼' ÷É±'÷Óùõþ qñÅ ö±õþËîõþ Õîîî ÎáÌõþËõ Õõá±ýò ßËõþò¿ò, ö±õþËîõþ õþ±æÍò¿îß ó¿õþ¿¦š¿î ¿õøËûþÝ îÒ±õþ ছিল সজাগ আগ্রহ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নিয়মিত পত্রালাপ চলত তাঁর আমাদের প্রধান রাজনীতিবিদদের সঙ্গে। নীরদবাবু শুধু ভারতীয় ও পশ্চিমি সভ্যতার অবনতি ও পতনের জন্য দীর্ঘশ্বাসই ফেলেননি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। নচিকেতার মতোই অন্বেষা তাঁর।

ম্যাক্সমূলর রচনাবলির মধ্যে বিশেষ স্থান আছে 'ইন্ডিয়া হোয়াট ইট ক্যান্ টিচ আস' গ্রন্থটির। বইটি পড়তে পড়তে পাঠকের বিশ্বাসই হয় না যে ম্যাক্সমূলর কখনো ভারতে আসেননি। ১৯০০ সনে তাঁর মৃত্যুর ফলে আমরা প্রকৃতই এক মহান বন্ধুকে হারালাম, ন্যায্যতই যাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'মোক্ষ মূল'। নীরদচন্দ্রের রচনাবলির মধ্যে বিশেষ স্থান আছে তাঁর 'হিন্দুইজম' গ্রন্থটির। গ্রন্থটির লেখক যেন এক আধুনিক নচিকেতার মতো হিন্দুত্বের রূপরেখাকে পেশ করেছেন একসারি প্রবন্ধের মাধ্যমে। ১৯৯৯-এর ১লা আগষ্ট ইংলন্ডের অক্সফোর্ডে নীরদচন্দ্রের মহাপ্রয়ান ঘটে। তাঁকেও ন্যায্যতই উপাধি দেওয়া যায় 'মোক্ষ মূল', যাঁর জীবন 'কেন বাঁচব' ও কীভাবে বাঁচব'-র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ò¿äËßî±
Ëßò ¿ôËõþ Õ±Ëü± õ±õþ-õ±õþ·
¦œÔ¿îõþ îÅø±õþ ÎìËß ÎßÒËð ÛËü úÍËîõþ îÅø±õþ
Ëßò ÎýÒËé ó±õþ ýËî ä±Ý·
Û÷ò ¿òæÇò õþ±Ëî Îüý× öËûþ òŽS ë×ñ±Ý
Õò™L Õ±ß±ú ÎìËß, Îü-¿ò÷Ç÷ Î÷Ëâõþ ßÅûþ±ú±
Ëß±ò üÅËà õÅËß é±ò±· Û-òõþËß ¿ßËüõþ ›¶îÉ±ú±·
îÅ¿÷ ¿ß æËò± ò±€ û±õþ± Õ±Ëü
Õ±ß_ ¿óó±ü± ¿òËûþ üÓûÇýÏò Û ÎüÌõþ Õ±ß±Ëú
ä±õþ¿ðËß ÷Ôî áèýËðõþ
ßõõþ, ›¶™¦õþ ÎöËã Õ±Ëü€ î±õþ± ¿òËæ¿õþ õþËMõþ
¿óó±ü±ûþ æ;Ëù¼ Îß±òà±Ëò Îòý× ÛßËôÒ±é± æù€
ðÏâÇ«±Ëü ¿Zà¿`î Û ÷±¿éõþ Õ|ný× ü¥¤ù¼
Ëßò îËõ üõ öÅËù û±Ý·
Õ±ü÷Å^¿ý÷±äù Ûý× ÷ý±úÓËòÉõþ ß±i§±ûþ
Ëßõù óqõþ òà ð±á ß±Ëé€ ¿õø±M ý±Ýûþ±ûþ
ü±Ëóõþ Îà±ùü&¿ù ö±Ëü qñÅ€ Õ±õþ
¿ðòõþ±¿Sõþ õÅßô±é± ' Îòý×, Îòý× Îòý×' - Ûõþ ¿äÈß±õþ¼
Ëü ¿äÈß±Ëõþ ¦¤áÇ-÷îÇÉ éËù
ó±ïõþÝ ÎäÌ¿äõþ ýËî± ö±õþîõËøÇõþ õgÉ± ó±ïõþ ò± ýËù¼
æêËõþõþ ÕüýÉ ŽÅñ±ûþ
ñÓ÷±õîÏ æiœöÓ¿÷ ü™L±Ëòõþ ðÅ¿öÇËŽõþ ö±î ÎßËh à±ûþ,
Û-ßÏ ¿äS¯ òõþËßõþ üÍ÷±
Ëä±à Õg ß'Ëõþ Îðûþ, ÷ÅËå Îòûþ Îäîò±õþ ü÷™¦ òÏ¿ù÷±¼
î±ý× ¿òËûþ ò¿äËßî±, îõÅ îÅ¿÷ áhËõ ›¶¿î÷±·
Õg ýËõ, Îõ±õ± Ý ÕñÏõþ

îõÅ ßv±¿™Lýÿ̈ò, ÷Ô¿Mß±ûþ óÅòæÇËiœ Õ¿¦šõþ
¿æ:±ü±õþ ÷ÔîÅÉõþ îÅø±õþ
õ±õþ õ±õþ ÎýÒËé ýËõ ó±õþ·
Õ¿¢Ÿð* ðÅý× ý±Ëî ßîõ±õþ àÅùËõ îÅ¿÷ ûË÷õþ ðÅûþ±õþ·
------ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গড়পড়তা ভারতীয় যে মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে, তার কাছে নচিকেতার মতো নীরদ চৌধুরীও এক চ্যালেঞ্জ। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'আমাদের মনের বদ্ধ দরজায় তিনি প্রবল ঘা মারেন। আর সেই ঘা-য়েরপ্রতিক্রিয়ায় যদি আমার মনের বদ্ধ অর্গল খুলতে পারি তবে নীরদচন্দ্রের রচনার সওয়ার হয়ে যে খোলা হাওয়া আমাদের মনোরাজ্যে প্রবল বেগে প্রবেশ করে তাতে কেবল সুদূরেরই আহ্বান পাওয়া যায় না, ত্রিকালেরও ইঙ্গিত মেলে। আমাদের বহু দিনের বহু প্রচলিত ধ্যান-ধারনা বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করতে আমরা বাধ্য হই নীরদচন্দ্রের তথ্য ও যুক্তি ঋদ্ধ সূচীমুখ রচনাগুলি পাঠ করলে।'

সুতরাং এ-প্রবন্ধ শেষ হতে পারে শতবর্ষে পদার্পণ করার মুহূর্তে নিজের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে তাঁর আপন ভাষ্য দিয়ে 'আমি আমার নিন্দুকদের জবাব দিয়াছি আমার কাজের দ্বারা, বলিতে গেলে লেখালেখি করিয়াই আমি একজনকর্মযোগী হইয়াছি। লেখক জীবনে আমি সর্বদাই 'আঁগাজে' (দায়বদ্ধ) বলিতে যাহা বোঝায় তাহাই। আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও জানিয়াছি তাহাতে নিজেকে জড়াইতে ও তাহার সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া জানাইতে কখনও পিছপা হইনাই।

আরও বলি, আমি অকপটে স্বীকার করি যে লেখক জীবনের শেষভাগে আসিয়া আমি এখন মতান্ধ তাত্ত্বিক। আমি দুইটা বই লিখিয়াছি যাহা স্পষ্টত মতান্ধতায় পূর্ণ। ইহার মধ্যে একটি গ্রন্থের বিষয় বর্ননায় লাতিন বাক্যাংশ হইতে ধার করিয়া আমি উহা স্বীকার কবিয়াছি ঃ ডড্র ত্মড্রত্মহুত্ত ঢত্ত্বড্ডঢট্রট্টত্মহুত্ত ত্ত্বট্টবহুত্মট্ট•ö±õþiÏûþ õdü÷ÓËýõþ ›¶ßÔ¿î ¿õøËûþ — Õ±¿÷ õ±ý×ËõËùõþ ë×XÔ¿î ¿ðûþ±Ý Õ±÷±õþ ÷î±gî± ¦¤Ïß±õþß¿õþûþ±¿å '' üßù æÏ¿õî ›¶ ±ílËðËý Õ±¿÷ Õ±÷±õþ Õ±¿Rß ú¿M ì±¿ùûþ± দিব এবং তোমার পুত্রকন্যাগণ ভবিষ্যৎবাণী করিবে, তোমার বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমার যুবকেরা কল্পদৃষ্টি অর্জন করিবে।"

তাই আমি কেবল সাংবাদিক নই, তাহার অতিরিক্ত কিছু। আসলে আমি একজন সত্য-প্রচারক। আমি নিজেকে বলি প্রজ্ঞা কী জানিবার জন্য আমি মনোনিবেশ করিয়াছিলাম এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মহৎ অভিজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গিয়েছে।

কিন্তু আমার নির্ধারিত মূল্যে আমার বাণী আমার স্বদেশবাসী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে নিছক 'বাভারদাজ' (গালগপ্প) বলিয়া ধরিয়াছেন। হয়তো ফর্মের দিক হইতে ইহা তাহাই। যাহাই হোক, আমি এইটুকু বলিব যে আমার এই সকল 'ব্যাবিল' - এর (বকবকানি) মধ্যে চিন্তার স্বচ্ছতা বা সততার অভাব নাই এবং বীরত্ব না হইলেও স্পষ্টবাদিতার অভাব আমি কখনও দেখাই নাই। ইহার আমার লেখক বৃত্তির কৈফিয়ৎ।'

এক অজ্ঞাত ভারতীয় রূপে জীবন শু করে নীরদচন্দ্র বিরল প্রতিভা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রখর ধীশক্তি ও বিস্ময়করস্মৃতিধার্যতার গুণে তাঁর জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' --- যিনি পৃথিবীতে একশো বছর বেচেঁ থাকতে ইচ্ছুক, তিনি সৎ কর্মকরেই বাঁচিতে ইচ্ছা করবেন। শতায়ু নীরদচন্দ্র তাই সক্রিয় ও সৃজনশীল হয়ে এবং শেষদিন পর্যন্ত আপন কর্ম করেই বেঁচেছেন।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com